

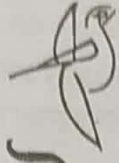


দইয়ল

গানের কাগজ

১

শুভেন্দু ইমাম মনসা মঙ্গল ও একটি এটলাস ছাত
দেবতোষ গুহ আজো মনে পড়ে মানসী প
প্রসঙ্গ আগমনি গান সঞ্জীব দেবলস্কর শ্রবণ
পেতে রই শাকুর মজিদ তুই ফেলে এসেছিস
নিরে রাখাল রাহা যে গানে জ্ঞানের দুয়ার খে
কাতর প্রেমিকের গান মোস্তাক আহমাদ
বাংলাদেশ সাইম রানা লেখার শক্তি জোগায়
দেখে গান গেও না কাজী আলিম-উজ-জামা
মেহেদী গানের ভিতর দিয়ে পিয়াস মজিদ
ভট্টাচার্য মোহরদি শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত আমি কান পেতে রই লোকগানে
রণেন রায়চৌধুরী শুভেন্দু ইমাম মনসা মঙ্গল ও একটি এটলাস ছাত
গল্প মৌসুমী ভৌমিক সুর না সংগীত? দেবতোষ গুহ আজো মনে প
মানসী পাল রামকানাইদা তুষার কর প্রসঙ্গ আগমনি গান সঞ্জী
দেবলস্কর শ্রবণ সুকান্ত মজুমদার আমি কান পেতে রই শাকুর মজিদ
ফেলে এসেছিস কারে, মন প্রশান্ত মৃধা গান নিয়ে রাখাল রাহা যে গা
জ্ঞানের দুয়ার খোলে সাইমন জাকারিয়া দগ্ধ-কাতর প্রেমিকের গ
মোস্তাক আহমাদ দীন গণসংগীত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ সাইম রা
লেখার শক্তি জোগায় সংগীত স্বকৃত নোমান খাতা দেখে গান গেও
কাজী আলিম-উজ-জামান শত মুখ তবু একা উজ্জ্বল মেহেদী
বানাইল এমন রঙমহলখানা আজাদুর রহমান গানের রবীন্দ্রনাথ
তপোধীর ভট্টাচার্য মোহরদি শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত আমি কান পেতে রই স্ব
রায় লোকগানের রণেন রায়চৌধুরী শুভেন্দু ইমাম মনসা মঙ্গল ও এক
এটলাস ছাতার গল্প মৌসুমী ভৌমিক সুর না সংগীত? দেবতোষ গ
আজো মনে পড়ে মানসী পাল রামকানাইদা তুষার কর প্রসঙ্গ আগম
গান সঞ্জীব দেবলস্কর শ্রবণ সুকান্ত মজুমদার আমি কান পেতে র
শাকুর মজিদ তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন প্রশান্ত মৃধা গান নি
রাখাল রাহা যে গানে জ্ঞানের দুয়ার খোলে সাইমন জাকারিয়া দগ্ধ
কাতর প্রেমিকের গান মোস্তাক আহমাদ দীন গণসংগীত : প্রেক্ষাপ
বাংলাদেশ সাইম রানা লেখার শক্তি জোগায় সংগীত স্বকৃত নোমান খা
দেখে গান গেও না কাজী আলিম-উজ-জামান শত মুখ তবু একা উজ্জ
মেহেদী গানের ভিতর দিয়ে পিয়াস মজিদ গানের রবীন্দ্রনাথ
মোহরদি শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত আমি কান পেতে রই স্বপ্না
লোকগানের রণেন রায়চৌধুরী শুভেন্দু ইমাম মনসা মঙ্গল ও এক



দইয়ল

গা নে র কা গ জ



দইয়াল
গানের কাগজ
প্রথম সংখ্যা
১ কার্তিক ১৪২১ বঙ্গাব্দ
সম্পাদক সুমনকুমার দাশ

ভাইল

১৬ অক্টোবর ২০১৪

৫

প্রকাশক সুমন আহমদ
মুদ্রণ রিমন কম্পিউটার অ্যান্ড গ্রাফিক্স, জিন্দাবাজার, সিলেট
পরিবেশক বইপত্র, ৯০ রাজা ম্যানশন, জিন্দাবাজার, সিলেট

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
৪৩-৪৪ রাজা ম্যানশন, তৃতীয় তলা, জিন্দাবাজার, সিলেট
মোবাইল : +৮৮০১৭১২৮৫৬৩৫৩

প্রচ্ছদ আবু আদনান

৫০ টাকা

Daiol
First Issue
16th October 2014
Edited by Sumankumar Dash
Published by Suman Ahmed
43-44 Raja Mansion, Zindabazar, Sylhet
e-mail : sumankumardash@gmail.com
Tk. 50

দইয়ল

প্রথম সংখ্যা

১ কার্তিক ১৪২১

সূচি

সম্পাদকীয় ৫

গানের রবীন্দ্রনাথ | তপোধীর ভট্টাচার্য ৭

মোহরদি | শর্মিষ্ঠা দাশগুপ্ত ২৩

আমি কান পেতে রই | স্বপ্না রায় ২৭

লোকগানের রণেন রায়চৌধুরী | শুভেন্দু ইমাম ৩৮

মনসা মঙ্গল ও একটি এটলাস ছাতার গল্প | মৌসুমী ভৌমিক ৪৬

সুর না সংগীত? | দেবতোষ গুহ ৫৫

আজো মনে পড়ে | মানসী পাল ৫৭

রামকানাইদা | তুষার কর ৬২

প্রসঙ্গ আগমনি গান | সঞ্জীব দেবলস্কর ৬৬

শ্রবণ | সুকান্ত মজুমদার ৭৪

আমি কান পেতে রই | শাকুর মজিদ ৮১

তুই ফেলে এসেছিস কারে, মন | প্রশান্ত মৃধা ৮৬

গান নিয়ে | রাখাল রাহা ৯১

যে গানে জ্ঞানের দুয়ার খোলে | সাইমন জাকারিয়া ৯৪

দন্ধ-কাতর প্রেমিকের গান | মোস্তাক আহমাদ দীন ৯৬

গণসংগীত : প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ | সাইম রানা ৯৯

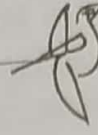
লেখার শক্তি জোগায় সংগীত | স্বকৃত নোমান ১০৫

খাতা দেখে গান গেও না | কাজী আলিম-উজ-জামান ১১০

শত মুখ তবু একা | উজ্জ্বল মেহেদী ১১৩

গানের ভিতর দিয়ে | পিয়াস মজিদ ১১৬

কে বানাইল এমন রঙমহলখানা | আজাদুর রহমান ১১৭



শ্রবণ

সুকান্ত মজুমদার

কলকাতায় আমাদের বাউল-ফকির উৎসবে প্রত্যেক বছর, সমগ্র অনুষ্ঠানটির রেকর্ডিং হয়। ভিডিও নয় অডিও। মেলার মধ্যে গাওয়া সব গানই যন্ত্রবদ্ধ হয়ে, ঘটনাচক্রে আমার কাছেই থাকে। তারপর বছর শেষে নতুন মেলার আয়োজনের আগে এইসব গান থেকে ঝাড়াই-বাছাই করে কিছু গান মেলায় প্রকাশিত অ্যালবামে রাখা হয়। এই কাজ করতে গিয়ে অনেক অনেক গান শোনা হয়ে যায়। একই গান বারে বারেও শোনা হয়। আর পেশাগতভাবে শব্দ মিশ্রণের কাজ করে থাকি বলে এ কাজ আমার উপরেই বর্তায় বছরের পর বছর। এ বছর এই কাজ করতে গিয়ে রাধেশ্যাম দাস বাউলের গাওয়া একটি গানের কয়েকটি পদ আটকে গেল কানে।

পরের কথা শুনে হরি বলে নাচিছো,
হরি কোথায় আছে তারে কি দেখেছো?
কেবল কানেতে শুনেছো, সোনা কি পশেছো?
(খ্যাপা) শোনা কথা মুখে এনো না এনো না।

[‘ইন্দ্রিয় দমন আগে করো মন’ গানের কয়েকটি লাইন। পদকর্তা, রাজকৃষ্ণ]

কাজটা শেষ হয়ে গেল, কিন্তু কথাগুলোর একটা রেশ থেকে গেল আমার মনে। পরে সেই কথা মনে মনে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখলাম, পুরো বিষয়টার মধ্যে কেমন এক প্যারাডক্সের ছোঁয়া রয়েছে। না, আমি এ গানের তত্ত্বের মধ্যে প্যারাডক্স খুঁজছি না। আমার মাথাব্যথা অন্য কারণে।

লোকসংগীত, এই জমানায় পুরোপুরি না হলেও, মূলত শ্রবণ-নির্ভর এক শিল্প। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে এর ধারাবাহিকতা শ্রুতি ও স্মৃতি নির্ভর। জানি রসিকজন বলবেন, আহা, এত সংকীর্ণ অর্থে কথাটা নিও না হে। হচ্ছে যাচাই করে নেবার কথা, শোনা তো এখানে রূপক মাত্র। ঠিকই। কথাটা আমি মানিও। তবু এই জায়গা থেকে আমি শুরু করলাম এই কারণেই যে, শ্রবণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে চলিত ধারণার একটা রূপ খুঁজে পাওয়া যায় এই কথা কয়টি থেকে। যে, যা দেখেছ, সেখানে সন্দেহের অবকাশ কম, কিন্তু ‘শোনা’ ব্যাপারটা ফুলপ্রফ নাও হতে পারে। কাণ্ডজ্ঞান সম্পন্ন পাঠক বলবেন, সে তো বটেই, লোকে তোমাকে মিথ্যে বলতে পারে, ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বাড়িয়ে বলতে পারে। একদম ঠিক। আমি মানিও। মিথ্যে অবশ্য দেখানোও যায়! সে আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক।

সুতরাং ওদিকে না গিয়ে এবং আরো বিস্তৃত যুক্তি জালে না জড়িয়েও বলা যায়, শ্রবণ সম্পর্কে আমাদের একটা সাধারণ মানসিকতার পরিচয় এই পদে আছে। সেটা হলো, দেখাটাই primary। সেই প্রক্রিয়ার প্রামাণ্যতার সঙ্গে শ্রবণের তুলনা চলে না। শ্রবণ প্রামাণ্য নাও হতে পারে।

আমি আলোচনাটা এখানেই আনতে চাইছি। পাঠক বুঝবেন, গানের আলোচনা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমি আমার বক্তব্যে প্রবেশের একটা রাস্তা খুঁজতে রাধেশ্যামদার গানের ঘাড়ে সওয়ারি হয়েছিলাম।

শ্রবণ সম্পর্কে এই আপাত নিস্পৃহ মনোভাবের কারণ কি?

আদিতম অনুভূতি

বিজ্ঞান বলে শ্রবণ মানুষের আদিতম অনুভূতির মধ্যে পড়ে। যখন মাতৃজঠরে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিকাশ সম্পূর্ণ হয়নি, শ্রবণেন্দ্রিয় তখনই সুগঠিত ও তার কাজ শুরু করে দিয়েছে। মায়ের নড়াচড়া, কথা বলার একটা তরঙ্গবাহিত রূপ আমরা অনুভব করতে শুরু করেছি। পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, শ্রবণ আমাদের স্মৃতি-চেতনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করে রয়েছে। বাইরের পৃথিবীর রং-রূপ-গন্ধ-স্পর্শে আমরা আত্মহারা হয়ে থাকলেও, শ্রবণ ও স্মৃতি নিঃশব্দেই আমাদের শোনা শব্দের একটা memoir রচনা করে রাখছে। যা আমরা নির্দিষ্টভাবে লক্ষ না করলেও, আমাদের আচার আচরণে প্রকাশ করছি। সেই virtual memoir আমার শোনাকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করছে।

আর একটু খুলে উদাহরণ সহযোগে বলা যাক।

পাঠক, noise বা বিরক্তি উদ্বেককারী শব্দ, গোলমাল ইত্যাদির সঙ্গে আপনাদের পরিচিতির বিষয়টা একটু ভাবতে চেষ্টা করুন।

কোনো কোনো শব্দকে আপনি মনে করেন গোলমাল, হট্টগোল? সকলেই বলবেন যা আপনাদের শুনতে ভালো লাগে না, মনঃসংযোগে ব্যাঘাত ঘটায়, সেইসব আওয়াজ। ক্ষেত্র-সমীক্ষায় দেখা যায়, যে শব্দ একজনের কাছে noise, অন্যজনের কানে বা মনে তার কোনো প্রভাবই নেই!

একটা ব্যস্ত শহরের বড়ো রাস্তার ধারে একটি বাড়িতে যে বাচ্চা বড়ো হচ্ছে, তার কাছে ট্রাফিকের শব্দ, কোনো আলাদা করে শোনার ব্যাপারই নয়। সেই বাড়িতেই তার গ্রামের আত্মীয়, একই বয়সের বাচ্চা এলে, গাড়ির শব্দে, হর্নের আওয়াজে, লোকজনের চিংকারে উৎকর্ষিত হয়ে সে বেচারি হয়তো ঘুমোতেই পারবে না।

আবার উল্টোটাও হয়। বেশি নিস্তর্রতা কারো কারো সহ্য হয় না। Noise এর অভাবটাই তখন noise! তাঁদের অবচেতনে শব্দের যেন একটা কার্পেট বিছানো আছে, সেটা না থাকলে কেমন খালি খালি ঠেকে!

পাঠক, নিজেদের গান-বাজনা শোনার অভ্যেসের কথাটাও একটু স্মরণ করুন। যে সংগীত রসে আপনি আপ্ত, আপনার নিজের সন্তানই হয়তো আপনার সেই শোনার অভ্যাসে অত্যন্ত বিরক্ত! আবার তার যা শোনার অভ্যাস, তাতে আপনি কোনো রসই পান না! উপরন্তু কেউ কেউ মনে করেন, এ কোনো সংগীতই নয়। এ চিংকার। অহেতুক noise। আশা করেন সন্তান একদিন সুপথে আসবে!

তাহলে দেখা যাচ্ছে শ্রবণ বিষয়টা সম্পর্কে আমাদের পছন্দ-অপছন্দের বহর নিতান্ত কম নয়। আমরা রীতিমতো খুঁতখুঁতে ও নিজেদের অভ্যাসের বিষয়ে যথেষ্ট ওয়াকবিহাল।

কথাটা হচ্ছে এই অভ্যাস এল কোথা থেকে?

আমরা সজ্ঞানে চর্চা করে কিছু কিছু অভ্যাস গড়ে তুলি ঠিকই, কিন্তু বেশিরভাগ অভ্যাসই আমাদের বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে গড়ে ওঠে। শ্রবণ প্রক্রিয়াও তার ব্যতিক্রম নয়। আমরা যে পরিবেশে বড়ো হচ্ছি, সেই পরিবেশের শাব্দিক চরিত্র আমাদের অবচেতনায় যে স্মৃতিকথা অবিরত লেখা হচ্ছে, তার উপর প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

এর উদাহরণ আমরা সবসময় পাই।

কোনো বিশেষ শব্দ, অনেকদিন পর হঠাৎ করে কানে এলে মন স্মৃতিমেদুর হয়ে ওঠে। সে কোনো মানুষের গলার আওয়াজ হতে পারে, হতে পারে বিশেষ কোনো ভাষার বিশেষ dialect এর ব্যবহার বা বলার ধরন; কোনো গান, পাখির ডাক, জলের শব্দ—যে কোনো কিছুই হতে পারে। আর খেয়াল করলে দেখা যায়, যে শব্দ আজ হঠাৎ শুনে এত কথা মনে আসা, আমরা প্রতিদিন যখন সে শব্দ শুনতাম, তার মধ্যে কোনো বিশেষ ভালোলাগার ব্যাপার ছিল না হয়তো। শব্দটি তার মতো করেই ছিল আশেপাশের আরো নানা দৃশ্য ও শব্দের মধ্যে মিশে। কিন্তু কখন যে সে এতখানি নিঃশব্দ প্রভাব বিস্তার করে বসে আছে, তা ঠিক ঠাহর করা যায়নি।

শব্দের এই নীরব আচরণের পিছনে আমাদের নিজেদের perception-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের চারপাশের জগৎ মূলত দৃশ্যময়। আমরা দৃশ্যের সঙ্গে যেভাবে যোগাযোগ তৈরি করতে অভ্যস্ত শব্দের সঙ্গে ততখানি করি না। মানে নিজে থেকে উদ্যোগী হয়ে মনোযোগের সঙ্গে করি না।

পাঠক, আপনাকে যদি প্রশ্ন করি আপনার ঘরটি কেমন দেখতে, কোথায় কি রয়েছে সে ঘরের, আপনি প্রায় নির্ভুল উত্তর দিতে খুব বেশি সময় নেবেন না। কিন্তু আপনাকে যদি প্রশ্ন করা হয়, আচ্ছা কেমন শুনতে আপনার ঘরখানি? আপনি থমকাবেন হয়তো। ভাববেন এ আবার কি প্রশ্ন? ঘর কি বাজনা নাকি যে শুনব!

আমি বলতে পারি, আপনার ঘর তো চিত্রকরের ছবিও নয়, চলচ্চিত্রও নয়, তবু তো দেখেন! একটা ছবি তৈরি করেন আপনার প্রিয় ঘরটিকে ঘিরে। ভাবেন কোথায় কি রাখলে সুন্দর দেখাবে আরো।

কিন্তু যে শব্দজগত ঘিরে রয়েছে আপনার ঘরকে, আপনার ও পরিবারের সকলের কণ্ঠস্বর, ভেসে আসা নানা শব্দ, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে গৃহস্থের অন্দরমহলের নানা আওয়াজ, তা তো আপনার পরিবারেই নির্মিত। সেই শব্দজগত হয়তো, বা হয়তো কেন, নিশ্চিতভাবেই খুব ভেবে চিন্তে নির্মিত নয়। যতখানি মনযোগ আপনি ব্যয় করেছেন ঘরটিকে সাজাতে, তার ছিঁটেফোঁটাও ভাবেননি তার আবহ সম্পর্কে। ঘরের সিলিং ফ্যানটি হঠাৎ ঘটর ঘটর শব্দ করতে শুরু করলে বড়োজোর মিস্ত্রি ডেকে তাকে নীরব করেছেন। কিন্তু এই সিদ্ধান্তই বা আপনি নিলেন কেন, যদি শব্দ সম্পর্কে আপনি এত উদাসীনই হন? নিলেন, কারণ দৃশ্য-সজ্জা সম্পর্কে আপনার পছন্দ-অপছন্দ যেমন তীব্র, শব্দ সম্পর্কেও আসলে তাই-ই। আপাতদৃষ্টিতে তা কেবল চোখে পড়ে না।

৭৬ দইয়ল

Hearing আর Listening

শ্রবণ প্রক্রিয়া বিষয়ে একটু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে শ্রবণ আর দু-একটা ইন্দ্রিয়ানুভূতির তুলনায় আর একটু বেশি মনোযোগ দাবি করে। ধরুন, সারাদিন খরতাপে দক্ষ হবার পর সন্ধ্যায় একটু হাওয়া ছাড়লে আরাম বোধ হয়। ঠাণ্ডা হাওয়ায় যে একটু আরাম হচ্ছে, সেটা আপনি আপনার গায়ে হাওয়া লেগে যে স্পর্শানুভূতির সৃষ্টি হচ্ছে, সেদিকে বিশেষ মনোযোগ না দিলেও বুঝতে পারেন। দৃশ্যের ক্ষেত্রেও এই মনোযোগের ব্যাপারটা আসে। বাংলায় আমরা 'দেখা' আর 'লক্ষ' করার মধ্যে তফাৎও করি এই মনোযোগের ব্যাপারটাকে 'লক্ষ করা' শব্দবন্ধের মধ্যে নিয়ে এসে।

বাংলায় শোনা সম্পর্কে এমন কোনো আলাদা শব্দের ব্যবস্থা না থাকলেও ইংরেজিতে আছে, এবং আমরা সকলেই 'hearing' আর 'listening' এর পার্থক্যও বুঝতে পারি। 'Listening' শব্দটির মধ্যে আমাদের এই মনের ব্যাপারটাকে বেশ সুন্দর করে স্থান দেওয়া আছে। 'Hearing' একটি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া আর 'listening' একটি মানসিক ও মানবিক প্রক্রিয়া। আমি এই লেখায় শ্রবণ বলতে সবসময় এই 'listening' এর কথাই বলছি।

এই শ্রবণ প্রক্রিয়ায় বাইরের পরিবেশের সরাসরি প্রভাব রয়েছে।

ধরুন আপনি একটি দ্রুতগামী ট্রেনের দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় ভ্রমণ করছেন। সেখানে আপনি সহযাত্রীর সঙ্গে নিচু গলায় কথা বললে, যদি না একেবারে কানের কাছে মুখ লাগিয়ে বলেন, সে কথা ঠিকমতো শোনা যাবে না। আবার সেই একই ট্রেনের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরায় যিনি ভ্রমণ করছেন, তিনি জোরে জোরে কথা বললে বরং অন্য লোকের বিরক্তির কারণ হবেন। কারণ সেখানে ট্রেনের চলার শব্দ এত জোরালো ভাবে শোনা যাচ্ছে না, যতটা যাচ্ছে আপনার খোলা জানালার কামরায়। আমাদের কানের এমনই গঠন, এই দুই অবস্থাতেই আমরা অন্যের কথা বেশ শুনতে পাই। যেখানে বাইরের শব্দ বেশি সেখানে হয়তো একটু খেয়াল করে শুনতে হয়, তারপরেও শোনা যায়। অনেক আওয়াজের মধ্যে, অন্য অনেকের কথার মধ্যেও যার সঙ্গে কথা বলছি বা যার কথা শুনতে চাইছি, সব কথাই আমরা দিব্যি শুনে ফেলতে পারি। শ্রবণ প্রক্রিয়ায় মনোযোগের গুরুত্বটা এর থেকে বোঝা যায়।

মনের সঙ্গে শ্রবণের যোগাযোগের বিষয়টা পর্যালোচনা করলে, শব্দের সঙ্গে আমাদের আন্তরিক যোগাযোগের কয়েকটা দিক স্পষ্ট হয়। বাংলায় একটা চমৎকার শব্দ রয়েছে—'উৎকর্ষ'। আমি যা শুনতে চাইছি তার জন্য অপেক্ষা করে থাকা।

আমি যদি জানি আজ-কালের মধ্যে আমার কাছে খুব প্রিয়জনের একটা চিঠি এসে পৌঁছেবে, নানা কাজের মধ্যেও আমার কান খাড়া থাকে দরজার ঘণ্টি শোনার জন্য। অথবা পিওনের ডাক, বা তার সাইকেলের বেল।

যে মা কোলের কাছে শিশুকে আঁকড়ে, রাস্তার ধারে ঘুমোচ্ছে, রাস্তার গাড়ির আওয়াজে তার ঘুম ভাঙে না, কিন্তু ওই ক্ষুদ্র শিশু সামান্য শব্দ করলে, কেঁদে উঠলে মায়ের ঘুম ভেঙে যায়।

শব্দ তো আদতে information। আমাদের কাছে সব শব্দই একটা বার্তা বয়ে আনে। সেই বার্তার পর্যালোচনা, তার প্রয়োজন, প্রয়োজন মতো প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি

সমগ্র প্রক্রিয়াটি আমাদের মনের ভিতর ঘটে চলেছে।

একটা চাক্ষুস information-ও যে মানুষ আওয়াজ দিয়ে মনে রাখেন সেটা দেখে ভারি চমৎকৃত হয়েছিলাম বছর দুয়েক আগে।

২০১২ সালের আগস্ট মাসে মৌসুমী ভৌমিক আর আমি, আমাদের Travelling Archive Project (আগ্রহী পাঠকেরা এই ওয়েবসাইটটি দেখতে পারেন, www.thetravellingarchive.org) এর কাজে বরিশাল ও সিলেট অঞ্চলে মনসামঙ্গল রেকর্ডিং এর কাজে আসি। দুটি জায়গাতেই মনসামঙ্গলের গানের বহুল প্রচলন এবং বিস্তৃতি দেখে আমরা এটুকুই বুঝি যে আমাদের আবার ফিরে আসতে হবে এখানে। এক যাত্রায় কিছু জানা-বোঝা সম্ভব নয়। যদিও পরের বছর আর ফিরে যাওয়া আমাদের হয়নি, নানাবিধ কারণে। যাই হোক, একটা ব্যাপার খেয়াল করে আমাদের বেশ অবাক লাগে যে, যারা মনসামঙ্গলের পুঁথি পড়ছেন, তাঁদের অনেকেই সেভাবে অক্ষর পরিচয় নেই। তবু তাঁরা পাতা উল্টে উল্টে, পালা করে করে, সুর করে দিব্যি পড়ে চলেছেন। কথা বলে বুঝতে পারি, পড়ার পদ্ধতিটা ওঁদের সম্পূর্ণ নিজস্ব। আমরা একটা শব্দকে (word) যেভাবে চিনি, ওঁরা সেভাবে চেনেন না। আমরা শব্দ (word) পড়ি অক্ষর চিনে, আর তার উচ্চারণ পদ্ধতি জেনে। ওঁরা শব্দ (word) পড়েন বা চেনেন একটা ছবি হিসাবে। আজন্ম কাল থেকে শুনে আসা ধ্বনির সঙ্গে সেই ছবি মিলিয়ে মনে রেখে দেন। বইতে একটা শব্দ (word) দেখা মাত্র ওঁদের মনে পড়ে যায় তার ধ্বনিটি। আমাদের যাদের অক্ষর পরিচয় আছে, তারাও একটা অক্ষরকে একটা ছবি ও তার অনুষ্ণের একটি ধ্বনি হিসেবেই মনে রাখি। তাই আমরা একটা শব্দ (word) তৈরি করতে পারি, অক্ষর জুড়ে জুড়ে; যুক্তি দিয়ে বুঝতে পারি কেমন হবে তার উচ্চারণ। কিন্তু ওঁদের কাছে একটা গোটা শব্দই (word) একটা শব্দ (word)! তাই অক্ষরের কারিকুরি সেখানে খাটে না। ওঁদের কাছে word একটি চিত্র আর একটি বিশেষ ধ্বনি সেই চিত্রের শাব্দিক প্রতিরূপ। বা উল্টোটা; একটি বিশেষ ধ্বনির ছবি হচ্ছে একটি বিশেষ word।

শব্দের ভিতরের বার্তা

শব্দের (sound) এই বার্তা দেবার ব্যাপারটা, মানুষ তার ভাষার প্রয়োগ, বাক্য-বিন্যাস এবং সেই বাক্যের ধ্বনিগত প্রকাশের মধ্য দিয়ে যেভাবে প্রকাশ করে, তার আলোচনা ভারি আকর্ষণীয়।

আমরা রবাহুত অতিথিকে এমন গলায় 'আসুন, বসুন' বলতে পারি যে তাঁর কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকলে তিনি তখনই চলে যাবেন! যদিও 'আসুন, বসুন' এর আক্ষরিক অর্থ তাঁর চলে যাবার সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ পরিপন্থী!

স্বরের ওঠানামা, সুর এবং গলার জোর বাড়িয়ে কমিয়ে আমরা এমন অনেক বার্তা হামেশাই দিয়ে থাকি, যেখানে বাক্যের আক্ষরিক অর্থ, বাক্যের অন্তর্নিহিত বার্তার সম্পূর্ণ বিপরীত! যেমন রেগে গিয়ে আমরা অনেক সময়ই বলে থাকি, 'আমি চিৎকার করছি না'!

এখানে ভাষার আক্ষরিক অর্থের ভাবটি গ্রহণ না করে, ভাষার ধ্বনিগত প্রকাশকেই আমরা তার অর্থ হিসেবে গ্রহণ করছি। মনের ভাব ও তার ধ্বনিগত প্রকাশ শুধু ৭৮ দইয়ল

মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, জীবজন্তুদের মধ্যেও যে একই রীতি লক্ষ করা যায়, আমরা সকলেই নিশ্চয় খেয়াল করেছি।

ভাষা ছাড়াও অন্যান্য নানা শব্দ বা আমাদের চারপাশের শব্দজগত আসলে একটি জটিল ও বহুস্তরীয় information আমাদের কাছে নিরন্তর পৌঁছে দিচ্ছে। সেই information বিশ্লেষণ করে দেখলে, পরিবেশের অবিরত নানা পরিবর্তনের একটা ইঙ্গিত মেলে। তবে তার জন্য প্রয়োজন একটি পরিচ্ছন্ন শ্রবণ-ব্যবস্থা। যা বিশ্বের এই ভাগে অবর্ণনীয় শোচনীয় অবস্থায় রয়েছে। প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে প্রবল শব্দ করাতে আমাদের বিশেষ পুলক। আমাদের রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, ধর্মীয়, বিধর্মীয় কোনো উৎসব অনুষ্ঠানই বিকট শব্দে লাউডস্পিকার না বাজিয়ে হয় না। রাস্তায় প্রবল জোরে জোরে হর্ন না বাজালে অনেকে ঠিকমতো গাড়িই চালাতে পারেন না। শব্দের ধর্মই হচ্ছে, বেশি জোরালো শব্দ কম জোরালো শব্দকে ঢেকে দেবে। এই প্রবল হট্টগোল আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে পড়ায়, আমাদের শারীরিক ক্ষতি যা হবার তা তো হচ্ছেই, অনেক ছোটো সূক্ষ্ম শব্দ আমাদের কানে পৌঁছচ্ছেই না। সম্পূর্ণ সুস্থ মানুষের কাছে এইসব শব্দ সেই মুহূর্তের জন্য প্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে, কিন্তু একজন অন্ধ মানুষের কথা ভাবুন। যিনি লাঠি ঠুকে, তার শব্দ শুনে বোঝার চেষ্টা করেন সামনের পথটা কেমন; কাদা আছে কিনা, জল আছে কিনা। তিনি যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, এত শব্দে তাঁর কানে, তাঁর লাঠির শব্দের ঐ জরুরি information-টুকু পৌঁছোনোই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আমাদের এই প্রবল জোরে শোনা বা চারপাশের কোনো কিছুই না শোনার অভ্যাসের ব্যাপারটা বেশ অদ্ভুত। ইদানীং বাইরের কোনো কিছুই না শোনার অভ্যাসটি প্রাদুর্ভাব ঘটেছে মোবাইল ফোন ব্যবহারের বাড়-বাড়ন্তের কারণে! তারপর থেকে সে আর শুধু ফোন নেই। একাধারে সে সবকিছুই। মানুষের প্রিয় বান্ধবের স্থান অধিকার করেছে।

কানে সারাক্ষণ ইয়ারফোন গোঁজা থাকলে কার পক্ষেই বা আর অন্য একটা শব্দজগতের অস্তিত্ব বোঝা সম্ভব? আমরা যে পরিবেশে বাস করছি তার শাব্দিক উপস্থিতি অস্বীকার করতে শুরু করেছি। তৈরি করছি এক নিজস্ব শব্দজগত, যেখানে প্রিয় গান, প্রিয় মানুষের কণ্ঠ, প্রিয় বাদ্য ছাড়া আর কিছুই নেই। এই সংকুচিত, সংকীর্ণ শব্দজগত, যে বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে মানুষের ও তার প্রাত্যহিক অভ্যাসের পরিবেশের মধ্যে, তার ফল খুব সুবিধের নাও হতে পারে।

মানুষের নিজস্ব পরিবেশের শব্দজগত তার নিজের নির্মাণ। একটা বিশেষ গোষ্ঠী বা সমাজ তার নিজস্ব শাব্দিক পরিচিতি নির্মাণ করেছে বলেই পৃথিবী এত বৈচিত্র্যময়। সে তার ভাষার ধ্বনি, সংগীতের ধ্বনি, জীবনযাপনের নিজস্ব খুঁটিনাটি শব্দের সমাহার নিয়ে স্বতন্ত্র। মানুষের এই নিজস্ব পরিচিতি একটি অত্যন্ত জরুরি বিষয়, যার ধ্বনিগত রূপ আজ বিপন্ন। ফিল্ড রেকর্ডিং এর অভিজ্ঞতায় বারেবারেই দেখেছি, সর্বগ্রাসী টিভি, মোবাইল ফোনের অত্যধিক ব্যবহার কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে একটি গোষ্ঠীর নিজস্ব শব্দজগতের উপর।

মানুষের প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ধ্বনির যে নিজস্ব প্রবাহ অব্যাহত ছিল, তা এখন আর মুখের ভাষাটুকুতেও বাধাহীনভাবে প্রবহমান নয়। ভাষার ধ্বনি তো আমাদের শব্দজগতের মুখ্য অংশ। সেখানেও ধ্বনির বহুমাত্রিকতা হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষের আর

পাঁচটা বৈশিষ্ট্যের মতো ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যও এখন একমাত্রিকতার প্রবণতা সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। রাধেশ্যাম দার গানের অন্তর্নিহিত বক্তব্য যাই হোক, শোনা কথাকে বা যে কোনো শোনাতেই, শোনার (listening) মর্যাদা দেবার সময় উপস্থিত।

ঋণ স্বীকার

এই লেখায় ব্যবহৃত দুয়েকটি উদাহরণ আমি Barry Truax এর *Acoustic Communication* বই থেকে নিয়েছি।

লেখক : শব্দধারক ও লেখক।